বাংলা ভাষা ও ভাষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা

আবু জার মোঃ আককাস

ajm.akkas@gmail.com http://bangalabhasha.blogspot.com/

সব হরফসমেত বাংলা বাক্য

ইংরেজিতে সব হরফসমেত এক বাক্যের সঙ্খ্যা অনেক, এবং সব চেয়ে প্রচলিত বাক্যটি হল A quick brown fox jumps over the lazy dog। বাংলায়ও এমন একটি বাক্য আছে, খুব প্রচলিত নয়। 'বিষণ্ণ ঔদাসীন্যে ঊষাবৌদি বাংলাভাষায় প্রচলিত নিখুঁত গল্পটি অর্ধেক বলতেই ঋতু ভুঁইঞা আর ঐন্দ্রিলা হৈ-হৈ করে উঠল --- ওঃ, থামো বুঝেছি বড়্ডো পুরাণো ঢঙের গল্প --- মূঢ় আড়ম্বর ও আত্মশ্লাঘার ফল জীবনে বিঘ্ন ও বৃহৎ ক্ষতি --- এ নীতি যার না?' বাক্যটিতে বাংলা বর্ণমালার প্রায় সব হরফই আছে, যদিও রচনাটা একটু আড়ষ্ট। বাক্যটি পাওয়া যাবে মনোজকুমার মিত্রের লেখা প্রবন্ধ "বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং বর্ণমালা"-য়। লেখাটি ছাপা হয়েছিল কলকাতা থেকে ১৯৯৩ সালে বের হওয়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বই 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা'-য়। রোমান হরফে লেখা হয় এমন ভাষায়, বিশেষত ইংরেজিতে, হরফযোজনা বা বর্ণবিন্যাসের উদাহরণে একটি লাতিন বাক্যের ব্যবহার করা হয় --- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum। প্রায় পনেরশ' খ্রিস্টাব্দ থেকে ছাপার উদাহরণে ইউরোপে এই বাক্যের ব্যবহার করা হতে থাকে। এতে করে বাক্যের বিষয়ের চেয়ে হরফের চেহারার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, কারণ ভাষাটা লাতিন। এই বিবেচনায় বাংলায় এমন একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদের ব্যবহার করতে হলে তা সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা পালি থেকে নেওয়া উচিত। কয়েকদিন আগে অনুজ এক বন্ধুর প্রশ্ন ছিল, বাংলার হরফযোজনার উদাহরণ হিসেবে এমন কোনও বাক্য বা অনুচ্ছেদের ব্যবহার করা হয়, বা যায়, কি না? এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কিছু চোখে পড়ে নি। বাংলা টাইপ ফাউন্ড্রির নমুনা বইয়ে দেখা যায় তারা বিভিন্ন লেখার অংশ হরফের চেহারা দেখাতে ব্যবহার করেছে।

সব হরফের বাক্য

খানিকটা আড়ষ্ট বাক্যকে সোজা করে অনুজ বন্ধু লিখে পাঠাল --- 'আকবর ঊষাকালে বৃহত্ ঐরাবতে দিল্লীর অর্ধেক প্রদক্ষিণ করতঃ হঠাত্ স্বগোতক্তি করিলেন এই ঢোল পাখোয়াজ সঙ্গীত আর সৌরভ মন্দ্রিত আড়ম্বরপূর্ন রঙিন জীবনের ছত্রতলে যে বিষণ্ণ দারিদ্র তাহা কি মোগল সাম্রাজ্যের ঈষৎ ঔদাসীন্য, প্রচলিত বৈদেশিক নীতি নাকি বারভুঁইঞার সহিত পুরাণো এবং আত্মঘাতী যুদ্ধের ফসল?' সাধু রীতির বাংলা, সব হরফ নেই। পরের দিন খানিকটা পরিবর্তন --- 'আকবর ঊষাকালে বৃহৎ ঐরাবতে দিল্লীর অর্ধেক প্রদক্ষিণ করতঃ হঠাত্ স্বগোতক্তি করিলেন এই ঢোল পাখোয়াজ সঙ্গীত আর সৌরভ মন্দ্রিত আড়ম্বরপূর্ন রঙিন জীবনের ছত্রতলে যে বিষণ্ণ দারিদ্র তাহা

কি মোগল সাম্রাজ্যের ঈষৎ ঔদাসীন্য, প্রচলিত বৈদেশিক নীতি নাকি বারভুঁইঞার সহিত পুরাণো এবং আত্মঘাতী যুদ্ধের ফসল?'

চলতি বাংলায় লিখতে গিয়ে খানিকটা আড়ষ্টতা আর এড়ানোই যায় না। --- 'আষাঢ়ের এক সকালে ঈষান কোণে মেঘের আড়ম্বর এবং সবুজে ঋদ্ধ এই বনভূমির নির্জনতা চিরে ঐরাবতের ডাকে মনে হল ঔদাসীন্যে ঝরে পড়া মাটির উপর শুকনো পাতার ফাঁকে জমে থাকা ঢের পুরনো যত গভীর দুঃখ হঠাৎ বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে অন্ধকার, ঊষর ও নঞর্থক জীবনে রঙধনু এনে দেবে।' সব হরফই আছে। হয়ত আর কয়েকবার এদিক ওদিক করলে একটু ভাল হতে পারে। খুব একটা না। কারণ বাংলায় শুদ্ধ ঞ দিয়ে শুটি কতক শব্দ আছে --- ভুইঞা বা ভুঞা, মিঞা, ডেঞে আর নঞর্থক। বাকি আরও শ' খানেক শব্দ পাওয়া যাবে যার ব্যবহার প্রচলিত বর্তমান বাংলায় নেই। সেগুলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

বাংলার হরফ, সংস্কৃতের বর্ণমালা

বাংলার হরফ নিজস্ব, তবে বর্ণমালা নিজের নয়। সংস্কৃত বর্ণক্রম বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়া, বা নেওয়া। বাংলার এই হরফ তার নিজস্ব হলেও গোটা চারেক ভাষা লেখার কাজে তা ব্যবহৃত হয় বা হত। বাংলা হরফে লেখা হয়, বাংলা এবং এর উপভাষা ছাড়াও, অহমিয়া, সংস্কৃত, সাঁওতালি আর মণিপুরি। সংস্কৃতের প্রধান লিপি এখন দেবনাগরীকে ধরা হয়, বিশেষত ইংরেজদের আগমনের পর থেকে। সংস্কৃতর রোমক হরফেও লেখা হয় আর লেখা হয় ভারতীয় বেশ কয়েকটি লিপিতে, তামিল-গোত্রীয় গ্রন্থ লিপি সহ। সাঁওতালি বাংলা ছাড়াও লেখা হয় ইংরেজি, দেবনাগরী এবং ওড়িয়া হরফে। ওল চিকি বলে একটি হরফেও। মণিপুরির এক অংশ যার নাম মৈতৈ তা লেখা হয় মৈতৈ নামের এক হরফে আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরির হরফ বাংলা।

এছাড়াও বাংলা দেশের বেশ কিছু উপজাতির ভাষা যেমন খাসিয়া, আচিক, ককবরক ইত্যাদি বাংলা হরফে লেখা হয়।
বাংলা হরফে লেখা অহমিয়া, সংস্কৃত, সাঁওতালি এবং মণিপুরির উদাহরণ ---

'কিয়নো ঈশ্বরে জগতলৈ এনে প্রেম করিলে, যে, তেওঁর পুত্রত যি কোনোৱে বিশ্বাস করে, সি নষ্ট নহৈ, অনন্ত জীৱন পাবর নিমিত্তে, তেওঁর সেই একজাত পুত্রকেই দান করিলে।'

(অহমিয়া)।।

'তদ্বদহং যুষ্মান্ ব্যাহরামি, একেন পাপিনা মনসি পরিবর্ত্তিতে, ঈশ্বরস্য দুতানাং মধ্যেহ প্যানন্দো জায়তে।'

(সংস্কৃত)।।

'এন্তে ঈশ্বর দ ধারতিরেন কো নুনাঃ এ দুলাড়কেৎ কোআ, আইঃরেন একুপুত হপনে এমকোদেতায়া, যেমন উনিরে সানাম পাতিয়াউঃকো আলোকো নষ্ঠোঃ। বিচকোম জায়জুগ জিওন কো এঞাম।'

(সাঁতালি, সাঁতাল পরগণা)।।

'করিননো হাইববু ঈশ্বরনা তাইবংপাম্বা অসিবু অসুপ নুংশিব্বি অসিনি, ইবুংঙো মহাক্কী অনিশুদবা মচা নিপা অদুবু পিবি, মচা অদুবু খাজবা মী পুম্নমক্ অদুবুদি মাংহনদনা লোম্বা নাইদবা খবাই ফন্দনি।'

(মণিপুরি)।।

আসামের উত্তর প্রচলিত রংদানিয়া বা রভা ভাষায় বাংলা হরফের উদাহরণ --- 'আতানা যে কাই ঈশ্বরনি খুসি ছাংয়ে ফুসিয়া, উ আংই ফজাংবারা, আরও আংই মমব্রাতাং, জিব্রা ফজমবারতাং আরও ওনিবারা আরও জিব্রা।'

রভা।।

অহমিয়া, সাঁওতালি এবং মণিপুরি বাক্যের বাংলা পাঠ --- 'কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাতা পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।' বাইবেলের পাঠ, হিস্পানি ভাষায় 'বর্তমান ও অতীতের বর্ণমালা' ওয়েব সাইট থেকে নেওয়া।

বাংলার যতিচিহ্ন

বাংলার দাঁড়িই, দুই দাঁড়িও, কেবল নিজস্ব যতিচিহ্ন। বাকি সব বাংলায় এসেছে ইংরেজির অনুকরণে। নিয়মিত হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। মধ্য বাংলায় বিরামের জন্য ব্যবহৃত হত তারকা চিহ্ন (*)। পরে সে স্থানে ব্যবহৃত হতে থাকে দাঁড়ি। দুই দাঁড়ি ছিল সাধারণত কবিতার সম্পত্তি, আগের যুগে। বর্তমানে তা টাইপোগ্রাফিক এমবেলিশমেন্ট। বাংলায় আরেকটি চিহ্নের ব্যবহার ছিল, মধ্যযুগেও। তার নাম কাকপদ (×)। প্রতিলিপির সময় কোথাও কিছু বোঝা না গেলে বা কোনও কিছু আমলে না নিলে, এখন যেমন ইংরেজি লোপচিহ্নের আদলে তিন-বিন্দু (...) ব্যবহার করা হয়, তখন বাংলা গুণনচিহ্নের মত তিনটি কাকপদ ব্যবহার করা হত।

বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণ থেকে ইংরেজির আদলে যতি চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। একদম শুরুর দিকে, ১৮৪০ সালে হিন্দু কলেজ পাঠশালাতে পড়ানোর জন্য 'শিশুসেবধি' নামের একটি প্রাইমার বা অ-আ-ক-খ'র বই ছাপানো হয়। এতে যতিচিহ্নের বর্ণনায় বলা আছে বাক্যের ভেদ বোধক রেখার নাম 'চিহ্ন' (,), বিচ্ছেদ ভেদবোধক রেখার নাম 'দাঁড়ি' (।) এবং লেখক কিংবা বক্তার কৃত যে প্রয়োগ তদ্বোধক চিহ্নের নাম 'অবিকল' (“”), যা এখন উদ্ধার চিহ্ন নামে পরিচিত।

নামগুলো পরে পালটে গিয়ে দাঁড়ায় পদচ্ছেদ (,), অর্ধচ্ছেদ (;), পূর্ণচ্ছেদ (।), দৃষ্টান্তচ্ছেদ (:), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), রেখাচিহ্ন (–), উদ্ধারচিহ্ন (“”) এবং পদযোজকচিহ্ন (-)। একসময় আবার বলা হত প্রাথমিকা (,), সামিকা (;)। কখনও বা কোলন ভুল করে বিসর্গ মনে না হয় তাই সাথে একটি ড্যাশ ব্যবহার করা শুরু হয়ে গিয়েছিল, নাম তার কোলন-ড্যাশ।

রোমক হরফে বাংলা

রোমক হরফে বাংলা লেখার চল অনেক পুরনো। ১৮৯৪ সালে জেনেভায় এক সংস্কৃতজ্ঞ সম্মেলনে রোমক হরফে সংস্কৃত কি ভাবে লেখা হবে তা ঠিক করা হয়। সেই নিয়ম মেনেই রোমক হরফে বাংলাও লেখা হচ্ছিল এতকাল। তারও আগে ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে ছাপানো বাংলার প্রথম ব্যাকরণ বই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Crepar Xaxtrer Orth,bhed,)-এ ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের বাংলার যে উদাহরণ দেওয়া আছে তাও রোমক হরফে, পর্তুগিজের পঠনরীতি অনুযায়ী লেখা – পিতা আমারদিগের, পরম স্বর্গে আসল। তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হউক: আইসুক আমারদিগেরে তোমার রাইজ্যত [রাজ্যে]: তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক: যেমন পরথিবীতে [পৃথিবীতে], তেমন স্বর্গে। (Pitá amaradiguer,/ Poromo xorgué aslo./ Tomar xidhi nameré,/ Xeba houq:/ Aixuq amardigueré/ Tomar raizot:/ Tomar zé icha,/ Xei houq:/ Zemon porthibité,/ Temon xorgué.) [আধুনিক বানানে বাংলায় লেখা হল]।

এরপর ১৮০৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপানো জন বোর্থউইক গিলক্রাইস্ট সম্পাদিত ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট নামের এক বইয়ে তারিণীচরণ মিত্রকৃত ঈশপের একটি গল্পের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় রোমক হরফে। ১৮৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী ছেপে বের হয় রোমক হরফে। এরপর ১৯৭১ সালে সুকুমার সেনের ইংরেজিতে লেখা বাংলাভাষার ব্যুৎপত্তিকোষেও (An Etymological Dictionary of Bengali) বাংলা শব্দ রোমক হরফে লেখা। মাঝে পুরো বই রোমক হরফে ছেপে বের না হলেও এই হরফে সংস্কৃত এবং বাংলা কি করে লেখা যায় তার দিক নির্দশনা দিয়েছে আর্থার কোক বার্নেল বা কার্ল রিকার্ড লেপ্‌সিউস-এর মত আরও অনেকেই।

সেই সংস্কৃতজ্ঞদের নিয়ম যা এখন আন্তর্জাতিক সংস্কৃত প্রতিবর্ণীকরণ বর্ণমালা (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) নামে পরিচিত, তাতে অবশ্য বাংলা লেখায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়। কারণ সংস্কৃতে বাংলার মত য়, ড় এবং ঢ় নেই। রোমক y দিয়ে সংস্কৃত য (य) এবং বাংলা য এবং য়, আর ṛ (r এর নিচে বিন্দু) দিয়ে সংস্কৃত ঋ (ऋ) এবং বাংলা ঋ এবং ড় লেখা হয়। সমস্যা হল পাঠককে বুঝে নিতে হয় একই হরফ কখন য এবং কখন য়, বা কখন ঋ এবং কখন ড়। এ সমস্যা দূর করতে আন্তর্জাতিক মান সংস্থার প্রবর্তিত আমাস ১৫৯১৯: দেবনাগরী এবং সম্পর্কিত ইন্দীয় লেখার লাতিন হরফে প্রতিবর্ণীকরণ (ISO 15919 Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters) পদ্ধতিতে y এর উপর বিন্দু ÿ দিয়ে য় এবং y দিয়ে য বোঝানো হয় আর r এর নিচে বিন্দু ṛ দিয়ে ড় এবং r এর নিচে বৃত্ত r̥ দিয়ে ঋ বোঝানো হয়। সমস্ত নব্য ইন্দো-আর্য ভাষার ক্ষেত্রে একই নিয়ম। অনুস্বারের ক্ষেত্রে রোমক সংস্কৃত হরফের ṃ-এর নিচের বিন্দু উপরে উঠে ṁ আসে।

বাংলার রোমক বর্ণমালা

যেখানে বাংলার জন্য বঙ্গলিপি ব্যবহার করা যায় না এমন ক্ষেত্রে রোমক হরফের ব্যবহার করা হয় হামেশাই। ইংরেজিতে বা রোমক হরফ ব্যবহার করে এমন যে কোন ভাষার কোনও বইয়ে এবং ইংরেজি খবরের কাগজে প্রতিনিয়ত। আগের সংস্কৃত লেখার নিয়মে পুরোপুরি বাংলা লেখা যায় না বিধায় আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ২০০১ সালে 'আমাস ১৫৯১৯: দেবনাগরী এবং সম্পর্কিত ইন্দীয় লেখার লাতিন হরফে প্রতিবর্ণীকরণ' নামের এক পদ্ধতি চালু করে। এই নিয়মে বঙ্গলিপির রোমক প্রতি-হরফ গুলো হল: অ (a), আ (ā), ই

(i), ঈ (ī), উ (u), ঊ (ū), ঋ (r̥), এ (e), ঐ (ai), ও (o), ঔ (au), ক (k), খ (kh), গ (g), ঘ (g h), ঙ (ṅ), চ (c), ছ (c h), জ (j), ঝ (j h), ঞ(ñ), ট (ṭ), ঠ (ṭh), ড (ḍ), ঢ (ḍh), ণ (ṇ), ত (t), থ (t h), দ (d), ধ (d h), ন (n), প (p), ফ (p h), ব (b), ভ (b h), ম (m), য (y), র (r), ল (l), শ (ś), ষ (ṣ), স (s), হ (h), ড় (ṛ), ঢ় (ṛh), য় (ẏ), ৎ (t [:]), ং (ṁ), ঃ (ḥ), এবং ঁ (m̆) (স্বরের সাথে ~ , উপরে বসবে)। সাথে যে নিয়মগুলো মানতে হবে তা হল প্রতিটি অন্তর্নিহিত অ লিখতে হবে; এই অ-এর অনুপস্থিতি বিরাম (হস বা হল) চিহ্ন হিসেবে পরের ব্যঞ্জনের সাথে মিলে যুক্তাক্ষর তৈরি করবে। যদি কখনও বিরাম চিহ্নের কারণে অনিভপ্রেত অক্ষর তৈরি হয় তা ঠিক করার জন্য দুই অক্ষরেরর মাঝে বা কোনও অক্ষরের আগে কোলন (:) চিহ্নের ব্যবহার করতে হবে, যেমন বই (b a :i) বা বৈ (b a i)। যে কোনও ব্যঞ্জনের সাথে য-ফলার জন্য y হলেও য-এ য-ফলার জন্য ẏẏ ব্যবহার করতে হবে। যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত থাকবে আর সঙ্খ্যা হিন্দু-আরবি সঙ্খ্যায় রূপান্তরিত হবে। যদি কখনও কম্পিউটারে ASCII-তে লিখতে হয় তার জন্য রোমক বর্ণমালাটি হল:

অ (a),
আ (a a),
ই (i),
ঈ (i i),
উ (u),
ঊ (u u),
ঋ (,r),
এ (e),
ঐ (a i),
ও (o),
ঔ (a u),
ক (k),
খ (k h),
গ (g),
ঘ (g h),
ঙ (;n),
চ (c),
ছ (c h),
জ (j),
ঝ (j h),
ঞ(~ n),
ট (.t),
ঠ (.t h),
ড (.d),
ঢ (.d h),
ণ (.n),
ত (t),
থ (t h),
দ (d),
ধ (d h),
ন (n),
প (p),
ফ (p h),
ব (b),
ভ (b h),
ম (m),
য (y),
র (r),
ল (l),
শ (;s),
ষ (.s),
স (s),
হ (h),
ড় (.r),
ঢ় (.r h),
য় (;y),
ৎ (t [:]),
ং (;m),
ঃ (.h), এবং
ঁ (~ m)

(স্বরের সাথে ~ , আগে বসবে)।

ছাপার জন্য রোমক বর্ণমালায় বাংলার উদাহরণ:

haẏato dekhibe ceẏe sudarśana uṛiteche sandhyāra bātāse. / haẏato śunibe eka lakṣmīpẽcā ḍākiteche śimūlera ḍāle. বা ASCII-তে ha;yato dekhibe ce;ye surar;sana u.riteche sandhyaara baataase. / ha;yato ;sunibe eka lak.smiip~ecaa .daakiteche ;simuulera .daale.

(হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে। / হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে)।

ইংরেজি পত্রিকায় বা খবরের কাগজে বা খানিকটা সরকারি কাজে যেখানে প্রতিবর্ণীকরণ কঠিনভাবে মানার প্রয়োজন নেই, সেখানের নিয়মটা একটু আলাদা। ১৮৭১ সালে ভারতের পরিসঙ্খ্যান মহাপরিচালক উইলিয়াম উইলসন হান্টার 'ভারতীয় নামের বানানের নির্দেশিকা'য় তারই ১৮৬০ সালের দিকে তৈরি করা এক লিপ্যন্তরীকরণ পদ্ধতির প্রকাশ করে। পরের বছর ভারত সরকার তা গ্রহণ করে। সেই হান্টারীয় (Hunterian) পদ্ধতিতে দীর্ঘ স্বরের উপরে মাত্রা (macron) বসবে (যদিও সার্ভে অব বাংলাদেশ গেল শতাব্দীর আশির দশক থেকে স্থানের নামের বানানের ক্ষেত্রে এই মাত্রা আর ব্যবহার করে না): অ (a), আ (ā/a), ই (i), ঈ (ī/i), উ (u), ঊ (ū/u), ঋ (r i), এ (e), ঐ (a i), ও (o), ঔ (a u), ক (k), খ (k h), গ (g), ঘ (g h), ঙ (n g), চ (c h), ছ (c h h), জ (j), ঝ (j h), ঞ(n y), ট (t), ঠ (t h), ড (d), ঢ (d h), ণ (n), ত (t), থ (t h), দ (d), ধ (d h), ন (n), প (p), ফ (p h), ব (b), ভ (b h), ম (m), য (y), র (r), ল (l), শ (s /s h), ষ (s h), স (s), হ (h), ড় (r), ঢ় (r h), য় (ẏ), ৎ (t), ং (m/n), ঃ (h), এবং ঁ (m)। উচ্চারিত না হলে অন্তর্নিহিত অ লেখা হয় না। জ্ঞ কে g y লেখা হয়।

ধরণির ধূলি আর ধরণীর ধূলী

বাংলা বানানের আধুনিক নিয়মে অ-সংস্কৃত সব শব্দে হ্রস্ব-ই ব্যবহারের রীতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির তাই মত। রানী, কাহিনী এবং ভিখারিনি শব্দগুলোও এখন রানি, কাহিনি এবং ভিখারিনি হিসেবে লেখা হচ্ছে, যদিও অনেকের, বিশেষকরে প্রাচীনপন্থীদের, একটু চোখে লাগছেও। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যা খোদ সংস্কৃত ভাষাতেই বিকল্পে হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ দিয়ে সিদ্ধ; এদের বেশিরভাগ শব্দই বাংলায় দীর্ঘ-ঈ দিয়ে প্রচলিত। তবে অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই এখন হ্রস্ব-ই জায়গা করে নিচ্ছে। তরী, সূচী, সূরী, অন্তরীক্ষ, শ্রেণী, অবনী, নালী, কিংবদন্তী, কুটীর, কুম্ভীলক, গণ্ডী, চীৎকার, ধরণী, ধূলী, বীথী, ভঙ্গী, মঞ্জরী, মসী, শ্রোণী, গাণ্ডীব, পেশী, বল্লরী, বেণী, ব্রততী, মালতী, যুবতী, লহরী, মূষীক, সরণী এবং স্বাতী শব্দগুলোর সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে তরি, সূচি, সূরি, অন্তরিক্ষ, শ্রেণি, অবনি, নালি, কিংবদন্তি, কুটির, কুম্ভিলক, গণ্ডি, চিৎকার, ধরণি, ধূলি, বীথি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, শ্রোণি, গাণ্ডিব, পেশি, বল্লরি, বেণি, ব্রততি, মালতি, যুবতি, লহরি, মুষিক, সরণি এবং স্বাতি হিসেবে লেখা সিদ্ধ। একতা বা সমতা বিধানের জন্য হ্রস্ব-ই দিয়েই শব্দগুলো লেখা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের লেখার ক্ষেত্রে হয়ত অনেকের জন্য সমস্যা দেখা দেবে কি লেখা হবে তা নিয়ে। গান গেয়ে তরি (না তরী) বেয়ে কে আসে

পারে। শব্দ না পাল্টে, বানান পাল্টানো অনেকটাই দস্তুর। শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের নাম The Tragedie of Hamlet থেকে The Tragedy of Hamlet হতে খুব বেশি সময় লাগে নি। প্রথম ফোলিও থেকে দ্বিতীয় ফোলিও, ১৬২৩ থেকে ১৬৩২; মাত্র ক'টা বছর। কোয়ার্টোতে অবশ্য নাম ছিল The Tragicall Historie of Hamlet। সেই হ্যামলেটেই প্রায় শুরুর দিকে ছিল Doth make the night ioynt labourer with the day; আমরা এখন পড়ি Doth make the night joint labourer with the day; আর মার্কিনি ছাপায় Doth make the night joint laborer with the day। কে বলে বানান পাল্টানো যায় না বা পাল্টায় না? আর স্যামুয়েল টেলর কোলারিজের ১৭৮৯-এর The Rime of Ancyent Marinere ১৮১৭-তে এসে The Rime of the Ancient Mariner, তার জীবদ্দশাতেই।

.....